শিল্পায়ন ও বামপন্থার সংকট

রতন খাসনবিশ

শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা নিয়ে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যা করছে বামফ্রন্টের সমর্থক বহু মানুষের মনেও তা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নতুন শিল্প গড়ার জন্য আগামী দু-এক বছরের মধ্যে যতটা জমির প্রয়োজন হবে, সরকারি ঘোষণা আনুযায়ী তার পরিমাণ বিশাল। অবিলম্বেই লাগবে ৯৯৮০ একর জমি এবং এর সবটাই দরকার হবে দক্ষিণবঙ্গে। সিঙ্গুরে লাগবে ১০০০ একর জমি। এছাড়া উলুবেড়িয়ায় ২০০০ একর, সাঁকরাইলে ১০০০ একর, খড়গপুরে ১২০০ একর, হলদিয়া - নন্দীগ্রামে ২৫০০ একর জমি প্রয়োজন হবে নতুন শিল্প গড়তে। কুলপিতে বন্দর এবং শিল্প বাণিজ্য গড়তে ৩০০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব আছে, রাজারহাটে - ভাঙড়ে লাগবে ৮৫০ একর আর বারাসাত থেকে কুলপি পর্যন্ত রাস্তা বানাতে উত্তর ও দক্ষিণ - চব্বিশ পরগণার মোট ৬০০ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। এ সব অধিগ্রহণের কথা উঠেছে রপ্তানি প্রক্রিয়া ক্ষেত্র (Export Precessing Zone) -এর জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবার আগেই। রপ্তানি প্রক্রিয়া ক্ষেত্র গড়ে তুলতে যা জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে, তার পরিমাণও বিপুল। এ সবের ফল কী দাঁড়াবে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর এতে আখেরে লাভ কী হবে, প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এসব নিয়ে। প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ আছে। ইতিপূর্বে রাজারহাট উপনগরী গড়তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২৬ হাজার পরিবার। বানতলা লেদার কমপ্লেক্সে উচ্ছেদ ও জীবিকাচ্যুতি ঘটেছে ১৫ হাজার পরিবারের। নতুন করে জমি অধিগ্রহণের যে ঢেউ উঠেছে তাতে কত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার কোনও হিসাব নেই। তবে শোনা যাচ্ছে, ভাঙড়ের প্রস্তাবিত উপনগরী এবং প্রস্তাবিত কুলপি - বারাসত রোড তৈরি করতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে মোট ৮২ হাজার পরিবার। সিঙ্গুর অথবা উলুবেড়িয়া, নন্দীগ্রাম কিংবা সাঁকরাইল— সর্বত্রই প্রস্তাবিত শিল্পায়নে বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে জনমানসে।

সি পি এম নেতাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ আবার এ আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলছে। তাঁরা কার সঙ্গে কী চুক্তিতে সই করছেন, সেই চুক্তির দায় কী, এ সব নিয়ে তাঁরা নানা সময়ে নানা রকম কথা বলছেন। কেন যে সিঙ্গুরেই টাটা কারখানা গড়তে দিতে হবে, এখনও তা স্পষ্ট নয়। ডানকুনি শিল্প-এস্টেট যা প্রায় অব্যবহৃত পড়ে আছে অথবা কল্যাণী শিল্পাঞ্চলের অব্যবহৃত জমি এবং তার লাগোয়া বিস্তৃত জলাভূমি— জাতীয় সড়ক, কলকাতা মহানগর, রেলপথ, বিমানবন্দর সব কিছুই যার অতি নিকটে, সে সব জায়গায় কেন মোটরগাড়ির কারখানা হবে না, কেন সিঙ্গুরের দু-ফসলি, তিন ফসলি জমিতেই এই কারখানা গড়তে হবে— এখনও তা স্পষ্ট নয় মানুষের কাছে। স্পষ্ট নয় বলেই এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে যে কাণ্ডজ্ঞানহীন এই সরকার সিঙ্গুরের বিকল্প কিছু হতে পারতো কিনা এ নিয়ে আদৌ চিন্তা করেনি। একই সঙ্গে ভাবা যেতে পারে সালিম গোষ্ঠীর লগ্নি নিয়ে সরকারি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কথা। এই গোষ্ঠীটি করে প্রমোটারির ব্যবসা। উৎপাদনভিত্তিক শিল্প স্থাপনের অভিজ্ঞতা বা আগ্রহ এদের কম আছে। যে জমি তারা নেবে তাতে হবে উপনগরী স্বাস্থ্যনগরী, লজিস্টিক হাব (অর্থাৎ বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট বানানোর লোহালক্কর, ইঁট বালি সিমেন্ট রাখার আড়ত)। এ সবের জন্য মুক্ত কচ্ছ হবার আগে ভাবা যেত এই সব কাজে বিনিয়োগের জন্য সালিম গোষ্ঠীকে ডেকে আনা আদৌ দরকার ছিল কিনা। এরা নাকি শিল্পনগরী এবং রাস্তাঘাটও তৈরি করবে। এ বিষয়ে তাদের কী অভিজ্ঞতা, এদের তৈরি শিল্পনগরীতে কী ধরনের শিল্পের জন্য পরিকাঠামো গড়া হবে, এ নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে আদৌ কোনও হোমওয়ার্ক করা হয়েছে কিনা, পশ্চিমবঙ্গবাসী তা জানেন না। দলীয় নেতারাও জানেন কিনা, সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ, তাঁদের বক্তৃতা ও লেখাপত্রে এসব নিয়ে খুব কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। শুধু জানা যায় যে 'ওরা শিল্পায়ন চায় না'।

জমি দখল করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্তা করতে হয়। এটাই সভ্য রীতি। এ নিয়ে বামফ্রন্ট যা শুরু করেছে তাতে বামপন্থীদের লজ্জায় মাথা হেঁট করা ছাড়া উপায় নেই। যে আইনে এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তা ১৮৯৪ সালের ব্রিটিশ আইনের রাজ্য সংস্করণ। সে আইনটিও আবার রেল কোম্পানির জমি দখলের জন্য ১৯৫৮ সালে যে আইনি ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার প্রায় ফটো কপি। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে 'জাস্টিস' -এর যে ধারণা, স্বাধীন ভারতের রাজ্য সরকারের আইনে মোটামুটি তাই আছে। এটা বলা যাবে না যে আরও মানবিক কোনও আইন রাজ্য সরকার করতে পারে না সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার কারণে। এই অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন বানানোর সংবিধান স্বীকৃত অধিকার আছে রাজ্য সরকারেরই।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণের সঙ্গে জীবন ও জীবিকা রক্ষার প্রশ্নটি যখন এসেছে, এক লজ্জাজনক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন বামনেতারা। 'ওরা উপনগরীতে ঝি-চাকরের কাজ করবে', টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে চাষের চেয়ে বেশি লাভ', 'এ সব জমি অলরেডি প্রোমোটারদের হাতে চলে গেছে' ইত্যাদি নানা মন্তব্য শোনা গেছে বামনেতাদের কাছ থেকে। এই মানুষেরাই যে তাঁদের উজাড় করে ভোট দিয়েছেন, এই মানুষেরাই যে তাঁদের ঝাণ্ডা ব'য়ে থাকেন, কথাবার্তায় কিংবা আচরণে তার কোনও প্রমাণই রাখছেন না তাঁরা। সিঙ্গুরে যেভাবে পুলিশি সন্ত্রাস চলেছে, প্রতিবাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক উপায়গুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, বামপন্থীরা এসব করাতে পারেন দুঃস্বপ্নেও তা ভাবা যায় না। কোনওমতে হাতে চেক গুঁজে দিয়ে এদের তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু যে করা যায়, বামনেতারা বোধহয় তা একেবারেই ভুলে গেছেন।

চেক হাতে গুঁজে দেবার জন্য যে টাকাটা দরকার, সিঙ্গুরে শোনা যাচ্ছে তার পরিমাণ ১৪০ কোটি টাকা। শোনা যাচ্ছে, কারণ তথ্য পাবার সাংবিধানিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কেউ টাটা - রাজ্য সরকার চুক্তির অবয়বটাও দেখার সুযোগ পাননি। টাকাটা দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগমের কাছে। কোথা থেকে টাকাটা এসেছে, তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত সরকারি কোনও এক বা একাধিক প্রকল্পের টাকা অর্থ দপ্তর মারফত হাত

বদল হয়েছে। আবার শোনা যাচ্ছে, টাকাটা এসেছে ব্যাঙ্ক - ঋণ হিসেবে। যে যোবেই আসুক, এই টাকা খরচ করে সরকারি কোষাগারে পরবর্তীকালে কী টাকা ফেরত আসবে, কেউ জানে না। টাটা কোম্পানি কি ঐ ১০০০ একর (কিছু কম) জমি সরাসরি কিনে নেবে? সম্ভবত না। যদি কেনে, একর প্রতি কী দর দেবে তারা? আমরা জানি না, কারণ এর জন্য প্রাসঙ্গিক যা কাগজপত্র তা গোপন রাখা হয়েছে। অন্য রাজ্যে যা হচ্ছে, এখানেও যদি সে রকমই হয়, তবে এই অধিগৃহীত জমি টাটা কোম্পানিকে লিজ দেওয়া হবে। লিজের শর্ত কী হবে? সম্ভবত এককালীন সামান্য কিছু টাকা টাটা কোম্পানি দেবে রাজ্য সরকারকে এবং তার পর লিজ রাখার জন্য বছরে বছরে সামান্য কিছু টাকা দেবে জমির উপসত্ব ভোগ করার জন্য। এটা যদি ঘটে তাহলে জমি হস্তান্তরের আর্থিক লেনদেন থেকে ঐ ১৪০ কোটি টাকা কোনওমতেই রাজ্য সরকারের কোষাগারে ফিরবে না। নিট লাভ হবে টাটা গোষ্ঠীর। ভাঙড়ের প্রস্তাবিত উপনগরী, কুলপির নদী বন্দর কিংবা নন্দীগ্রামের প্রস্তাবিত রাসায়নিক শিল্প কমপ্লেক্স— সর্বত্রই এরকমভাবে প্রায় বিনা পয়সায় জমি বিতরণ হবে।

এতে সন্দেহ নেই যে রাজ্য সরকার চলছে একটা কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে। বিশ্বায়নের ধাক্কায় এ রাজ্যের চিরাচরিত শিল্পগুলি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রযুক্তি এনে এগুলিকে চাঙ্গা করার ক্ষমতা নেই রাজ্য সরকারের। রাজ্যে আছে বিপুল বেকার বাহিনী এবং গত পনেরো বছরে ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই বেড়েছে ৩০ লক্ষ, যাঁরা বছরভর কাজ পান না। জীবিকার তাড়নায় এই রাজ্যের মানুষ পাড়ি দিচ্ছেন ভিন্ন রাজ্যে। যে 'ঝি - চাকরের কাজ শুনলে আমরা রাগ করি, দিল্লি - মুম্বাই-এ বহু বাঙালি সে কাজের সন্ধানে ভিড় করছেন। সল্টলেক -এর সেক্টর ফাইভ-এ তথ্য প্রযুক্তির কাজের নামে ক্রীতদাস প্রথা চলছে— এ কথা যখন আমরা বলি, তখন এটা ভুলে যাই যে ঐ কাজ করতেই আমাদের যুবক যুবতীরা বাঙ্গালোরে পাড়ি দিচ্ছেন। এর সঙ্গে এসে জুটেছে রাজ্যগুলির মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। শিল্পায়নের ওপর কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ উঠে গেছে— আমরা আর লাইসেন্স প্রথা চাই না, বাজার যা চায় সেভাবেই হবে শিল্পের স্থান নির্বাচন। অর্থাৎ, যে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের খরচ কম এবং পরিকাঠামো কম ব্যয়বহুল, শিল্প তৈরি হবে সে রাজ্যে। রাজ্যগুলি প্রতিযোগিতায় নেমেছে শিল্পপতিদের কম খরচের লোভ দেখিয়ে নিজ নিজ রাজ্যে টেনে আনতে। দরকার হলে বিনা পয়সায় শিল্পের জন্য জমি দেওয়া, সস্তা দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, সেল্স ট্যাক্স (ভ্যাট) মকুব— সব কিছুতে তারা রাজী। বামফ্রন্ট যদি ঠিক করে টাটাদের কনশেসন দেওয়া হবে না, টাটা গোষ্ঠী এ রাজ্যের বদলে উত্তরাখণ্ডে চলে যাবে মোটর গাড়ি কারখানা গড়তে। ঝাড়খণ্ড যদি আকরিক লোহা অন্য রাজ্যে পাঠাতে না চায়, তবে ইস্পাত শিল্পকে ঝাড়খণ্ডেই আসতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে তা আসবে না।

অবস্থার এই দিকগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং এই যুক্তি হবে দায়িত্বজ্ঞানহীন যে, তাহলে তাঁদের উচিত হল সরকারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে বামপন্থার কৌলিন্য রক্ষার লড়াই করতে নেমে পড়া। এ জন্য জনগণ তাঁদের ভোট দেননি। খুঁজতে হবে, এই অবস্থার মধ্যে সবচেয়ে ভাল কী করা যায়, যা জনগণের আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমাদের ধারণা, এই কাজটা করবার সাহস এবং উৎসাহ দুটিই হারিয়ে ফেলেছে ক্ষমতাসীন বামপন্থীরা।

জমি যদি এভাবেই দিতে হয়, তাহলে খুঁজতে হবে, সিঙ্গুরের মতো দু'তিন ফসলি জমি যাতে ক্যানেল ব্যবস্থা আছে, তার কোনও বিকল্প পাওয়া যায় কিনা। আমাদের অনুমান, এর জন্য যে হোমওয়ার্ক করার দরকার ছিল রতন টাটার সঙ্গে আলোচনায় বসার আগে, এই বামপন্থীরা সেটা করার চেষ্টাও করেননি। এই রাজ্যে কোথায় কী জমি আছে, কীভাবে তার ব্যবহার হয়ে থাকে, রাইটার্স-এর কর্তাদের কাছে তার তথ্য নেই। সব তথ্য জোগাড় করতে 'ম্যাকেনজি' লাগে না। কেরালায় 'পিপল্স প্ল্যান' শুরুর আগে যেভাবে পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় সম্পদের একটা খতিয়ান তৈরি করেছিল, বামফ্রন্ট নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েতগুলিকে কাজে লাগিয়ে সে রকম একটা খতিয়ান অনেক আগেই তৈরি করে ফেলা যেত। তা থেকে তৈরি করা যায় জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা এবং যাঁরা জমি নিয়ে শিল্প গড়তে চান তাঁদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সময় নিজেদের সুবিধা সবচেয়ে বেশি যাতে নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁরা সেটা নাকি করছেন। দপ্তরগুলিতে খোঁজ করলে জানা যায়, এরকম কিছু করা হচ্ছে কিনা, তাঁরা তা জানেন না।

বামফ্রন্টের একটা জোরের জায়গা এতদিন ছিল। সেটা হল তাঁদের সীমাবদ্ধতা কী, সেটা তাঁরা মানুষকে বলতেন। কী তাঁরা চাইছেন, সেটা বুঝতেও মানুষের অসুবিধা হত না। সরকার চালানোর ক্ষেত্রে এই যে স্বচ্ছতা, সেটা তাঁদের শক্তি, সেটা তাঁদের দুর্বলতা নয়। টাটাদের সঙ্গে ডিলটা কী, এর কোন্‌টা তাঁরা করছেন দায়ে পড়ে, এটা বলতে যে অসুবিধা দেখছি, তথ্য প্রকাশে তাঁদের যে অনিচ্ছা নানা ঘটনায় প্রকাশিত তাঁদের, তাতে মনে হয়, এই জোরের জায়গাটা তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন। তৃণমূলের সঙ্গে তরজায় তাঁদের যা উৎসাহ, তার কণামাত্র দেখা যাচ্ছে না শিল্পায়নের ব্লু-প্রিন্ট তৈরির কাজে। কোন্ এক প্রোমোটার উপনগরী বানাবে তা নিয়ে তাদের যা উদ্বাহু নৃত্য, সিঙ্গুরের চাষীদের লাঠিপেটা করতে তাদের যা হিংস্রতা, তাতে প্রমাণ হয়, জনগণের জন্য তাঁদের কী করতে হবে, সেটা ভাববার মানসিকতাও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন।

এ সব দেখে 'সংশোধনবাদের এই পরিণতি হয়', এই মন্তব্য করে নিজের প্রাজ্ঞতায় যাঁরা মুগ্ধ হন, তাঁদের বলি, এটা একেবারেই সুখের কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থা যদি পিছু পঠে, ভারতবর্ষের জন্যও তা গভীর বেদনাদায়ক পরিস্থিতির জন্ম দেবে। মানুষ ধরে নেবেন, ওয়াশিংটন নির্দেশিত উন্নয়নপন্থাই এই দেশের উন্নয়নের পথ। আর তা যদি ঘটে, তাহলে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞাজাত উক্তিগুলিও সমাজের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। যাঁরা ভাবেন, কথাটা ঠিক নয়, এর ফলে 'প্রকৃত' বামপন্থী আন্দোলনই জোরদার হয়ে উঠবে, তাঁদের স্মরণ করানো দরকার, যে ক্ষেত্রগুলি থেকে বামপন্থা হটে যাচ্ছে, সেগুলি 'সশস্ত্র ক্ষেত্রগুলিতে দাপিয়ে বেড়ায় এমন সময় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যাঁরা মনে করে, যে মার্কসবাদের 'সংশোধন' নিয়ে প্রাজ্ঞরা চিন্তিত, সেই মার্কসবাদই ইতিহাসের একটা বাতিল হয়ে যাওয়া মতবাদ।